International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-I, Issue-III, November 2014, Page No. 1-8
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

ছোটগল্পে নারীপ্রগতি : রবীন্দ্রনাথ ও মহাশ্বেতা দেবী

ড. প্রবীর প্রামাণিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Rabindranath Tagore left no branch of Bengali literature unexplored. Almost every aspect of literature was illuminated by his talent. He was a successful reformer in the branch of Bengali short story. Since his childhood period he observed very well the humiliating position of women in the then social life. Consequently he always tried to present the women folk in his stories with a position which they really deserved. He always advocated the emancipation and empowerment of the women. He did not agree to leave the fortune of women in the hands of fate. He was thoroughly against the engagement of the womenfolk within the day –to – day domestic social life. We found multi – faced dimensions in Tagore's conception of women's emancipation. Sometimes they made protest without uttering a single word; sometimes they were courageous to protest. If we go through his stories – "Mahamaya", "Shasti", "Didi", "Badnam", "Haimanti", "Durasha", we will found all heroines emancipating themselves with their own entity. With the passage of time they all took the desirable role. On the other hand, Mahasweta Debi was also uncompromising in the matter of women's progress and emancipation. She revealed the veil of shamelessness of our male dominated society. She tore all the masks from aristocrats to lower class people. In her stories – "Bishalaxmir Ghar", "Talak", "Jamunabatir Ma", "Shikar", "Standaynee", all heroines affirmed their own indentity. However there is a bit of difference between Tagore and Mahasweta Debi in the matter of women's progress and emancipation. Both they believe that women have come not to be humiliated and maligned their self. This article attempts to analyse and epitomise Tagore's and Mahasweta Debi's conception of women's progress and emancipation with the help of their stories

Keywords: Woman, Right, Progress, Emancipation, Empowerment, Development

রবীন্দ্রনাথ শুধু যে বিশ্বকবি ছিলেন তাই নয়, তিনি সমসাময়িক সমাজের একজন অন্যতম আদর্শবাদী অগ্রণী চিন্তানায়কও ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের যে পর্যায় শুরু হয় আমাদের দেশের ইতিহাসে, সেই যুগসন্ধিক্ষণে জাতীয় চেতনার অন্যতম প্রতিনিধিও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই জাতীয় চেতনার বাণীরূপ দিতে পেরেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের সেই যুগ 'রবীন্দ্রযুগ' নামে খ্যাত। এই যুগের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীপ্রগতির বিষয়টি কিভাবে প্রতফলিত হয়েছে, তার উল্লেখের পাশাপাশি বর্তমান সময়কালেও নারীবীক্ষার কথা এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনের পর বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীপ্রগতির সংগ্রাম নতুন পর্যায়ে এসেছে। রামমোহন বিদ্যাসাগরের যুগের সমাজসংস্কারান্দোলনের ফলে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অনেক প্রসারিত হয়েছে। সতীদাহ প্রথা আইনত নিষিদ্ধ হয়েছে। হিন্দুদের বিধবাবিবাহ চালু ও বাল্যবিবাহ রদ হওয়ার পথে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। নারীর মধ্যে একাংশ শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের পথে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। নারীর শিক্ষা ও সামাজিক অধিকারের সংগ্রামে বাংলার এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অগ্রণী মহিলারা সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। নারীজাগরণের বা নারীপ্রপগতির এই সামাজিক চিহ্নায়ণ রবীন্দ্রসাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেবেলা'র কথায় বলেছেন ---

> "আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। ... মেয়েদের বাইরে যাওয়া- আসা ছিল দরজা বন্ধ পালকিতে হাঁপ ধরানো অন্ধকারে, গাড়ি চড়তে ছিল ভারী লজ্জা। ... ঘরে যেমন তাদের দরজা বন্ধ তেমনি বাইরে

> বেরোবার পালকিতেও। বড় মানুষের কি-বউদের পালকির উপর আরো একটা ঢাকা থাকত মোটা ঘেরাটোপের। দেখতে হত যেন একটা চলতি গোরস্থান।"[১]

নারীদের জন্য এই সাবেকী ব্যবস্থা ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর 'ইয়ুরোপ যাত্রীর ডাইরি' পত্রের মধ্যে লিখেছেন ---

> "মেয়েরা আপনার স্নেহপরায়ণ সহৃদয়তা থেকে পুরুষের সেবা করে থাকে এবং পুরুষেরা আপনার উদার দুর্বল বৎসলতা থেকে স্ত্রীলোকের সেবা করে থাকে। যে দেশে স্ত্রীলোকেরা সেই সেবা পায় না, কেবল সেবা করে, সে দেশে তারা অপমানিত এবং সে দেশও লক্ষ্মীছাড়া।"[২]

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীকে যে কত বঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছে, তাঁর কবিতায় গভীর সংবেদনশীলতার সঙ্গে তা প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ্য, 'পলাতক' কাব্যগ্রন্থের মুক্তি ফাঁকি, নিষ্কৃতি, মায়ের সম্মান, কালোমেয়ে শীর্ষক কবিতাগুলি। এই সব কবিতার মধ্যেই নারীদের সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, পশ্চাদপদ ধ্যানধারণার বেড়াজাল ছিঁড়ে ব্যক্তিমানবের মোচনের প্রবল আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের ভাবে, ভাষায়।

সমাজ-পরিবারে প্রাত্যহিক জীবনে তথা নাটকীয় আকস্মিকতায় নারির দুর্ভাগ্য-দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথের অনেক গল্পে আছে। এইসব গল্পে মেয়েরা পণপ্রথা, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রভৃতি সামাজিক অপবিধানের দ্বারা বিশেষভাবে পীড়িত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নারীর এই দুর্বল রূপকেই শুধুমাত্র তাঁর রচনায় স্থান দিতে চাননি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মধ্যে আমরা এমন কিছু ছোটগল্পের সন্ধান পেয়েছি, যেগুলিতে তিনি নারীকে অন্য দৃষ্টি থেকে দেখছেন। পীড়নের প্রতিক্রিয়ায় এখানে নারী ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করেছে। এই ঘুরে দাঁড়ানো হতে পারে নিরুচ্চার তবে দৃঢ়, হতেপারে হাস্যের অন্তরালে আবৃত নীরব আত্মদানে - কিন্তু আত্মসমর্পণ নয়। হতে পারে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের আস্বাদ, অথবা সরাসরি বিদ্রোহ। এই রকমফেরের কারণ ঘটনাগত ও পরিস্থিতিগত পার্থক্য, যা সেই রমণীর স্বভাবের মৌল বৈশিষ্ট্য। এই বৈচিত্র্যের স্বরূপ আমরা দেখতেপাই - 'মহামায়া', 'শাস্তি', 'দিদি', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীরপত্র', 'অপরিচিতা', 'পয়লানম্বর', 'ল্যাবরেটরি', 'বদনাম' প্রভৃতি গল্পে। এই গল্পগুলিতে নারী সত্তার প্রতিবাদী রূপ আমরা প্রত্যক্ষ হতে দেখি। এই প্রতিবাদী সত্তার পেছনে তৎকালীন নারীর চিত্তমুক্তির জন্য সমাজের প্রগতিশীল অংশের যে ভাবনা তাও কার্যকর ছিল। দু-একটি গল্প দৃষ্টান্ত হিসেবে আলোচনা করা যেতে পারে।

'মহামায়া' গল্প হিসেবে অতি উৎকৃষ্ট, আবার এক বিদ্রোহিনী নারীর চরিত্র চিত্ররূপেও তা ভাস্বর। গল্পটির ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ সময়ের হিসেবে বেশ খানিকটা অতীতে চলে গিয়েছেন - তখন সাহেবরা রেশম কুঠিতে ব্যবসা করতো এবং দেশে ভয়াবহ কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। সহমরণও চলতো কখনো সখনো। নারীর উপর পীড়নের এই নিদারুণ বিষয় গল্পের অঙ্গ, পটভূমি মাত্র নয়। এইভাবে কাহিনিকে পিছনে ঠেলে নেওয়ার বিদ্রোহী নারীব্যক্তিত্ব একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে। নায়িকা মহামায়া সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্র সহমরণের চিতার আগুন থেকে উঠে এসেছে। যেমন ---

> "রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া, উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, মহামায়া তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ?' মহামায়া কহিল, হ্যাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক আমি নাই আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বলো, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনো আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"[৩]

সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে চলে গেছে-অবিবাহিত দম্পতি জীবন কাটিয়াছে। আবার যে মুহূর্তে তার দগ্ধমুখ প্রণয়ী দেখতে পেয়েছে তার মনে হয়েছে, এবার প্রেমিক রাজীবের প্রেমে করুণার স্পর্শ লাগবে, অমনি সে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। এই গল্পটিতে মহামায়া তার প্রণয়ীর করুণার পাত্রী হয়ে বাঁচতে চায়নি। নারীর আত্মসম্মান রক্ষায় মহামায়া দুর্মর, স্বতন্ত্র। সেতার নিজের পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছে। তার এই একলা চলার পথের ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন, তার দূরদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ সহযোগে।

'শাস্তি' গল্পের চন্দরা একটি গ্রাম্য চাষীর-বউ। তার স্বভাবে একটা স্বাধীনচিত্ততা ছিল। সংসারের প্রচলিত রীতিনীতিতে তার সেই স্বভাব-চাঞ্চল্যকে বাঁধা যেত না। ফলে স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রেম ও অবিশ্বাসে মিশে গিয়েছিল। ঘটনাচক্রে বড়জাকে তার ভাসুর রাগের মাথায় খুন করে। সেই খুনের দায় তার স্বামী চাপিয়ে দিল বউয়ের উপর। বাঁধা জন্তুর মতো চন্দরা নিজের স্বামীর কাছ থেকে এই অমানুষিক আঘাতের প্রতিশোধ নিল। সে সেই মিথ্যাকেই দৃঢ়ভাবে তার স্বীকারোক্তিতে সমর্থন করে চলল-ফাঁসিকাঠ পর্যন্ত একটুও টলল না। চন্দরা শেষ মুহূর্তে বলেছে---

> "জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল,
> 'কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে?'
> চন্দরা কহিল 'একবার মাকে দেখিতে চাই।'
> ডাক্তার কহিল, 'তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।'

চন্দরা কহিল, "মরণ--'"[৪]

আপাতভাবে মনে হতে পারে চন্দরা এক প্রতিবাদহীন চরিত্র, এ যেন অভিমানে আত্মহনন। কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায় শুধু অভিমান মানুষকে এত দৃঢ় করে না। অভিমান, ঘৃণা, ক্রোধ মিশে তাকে একটা উন্মাদ প্রত্যয়ে পৌঁছে দিল। তারমনে গভীর বিশ্বাস ছিল মিথ্যাচারী স্বামীর মনের গভীরে বিবেকের দংশন কোথাও নিশ্চয় আছে। সেখানে তার এই দর্পিত আত্মহনন আগুনের মতো জ্বলতে থাকবে। আসলে সে মৃত্যুবরণের মধ্যে দিয়ে তার দীর্ঘ তর্জনী প্রসারিত করে নিরন্তর অভিযোগ জানিয়ে গেল। প্রতিবাদের সেই উত্তাপে দগ্ধ হতে থাকে পুরুষ শাষিত সমাজ ব্যবস্থা, পৌরুষত্বের প্রতি নারীর এই নীরব ধীক্কার মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে নারীর জাগরণ ঘটে এই গল্পে।

একইভাবে 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীরপত্র', 'অপরিচিত', 'পয়লানম্বর' প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারী বিদ্রোহের নতুন রূপ এঁকেছেন। ইতিমধ্যে সমাজে এসেছে কিছু পরিবর্তন। নব্যভাব-ভাবনা চিন্তা চেতনার সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ পুরোনো ধ্যানধারণার সংঘাতের বাতাবরণ তখনও চলছে। 'হৈমন্তী' গল্পেও আমরা আচার-আচরণের মধ্যে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার উন্মেষ ঘটতে দেখি। হৈমন্তী অন্যগৃহবধুদের মতো শ্বশুর শাশুড়ির একেবারে বাধ্য নয়। হৈমন্তীকে চোখ টিপিয়ে ইশারা করিয়া শ্বাশুড়ি কোন মতে মিথ্যা কথা বলাতে পারেনি। হৈমন্তী সর্বদা সত্য কথা বলেছে। হৈমন্তীর ১৭ বছর বয়সে বিবাহ হওয়াকে সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। সেই জন্য হৈমন্তীর শাশুড়ি বলেছেন- বয়স ১১ বছর। হৈমন্তী এই মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করেছেন শাশুড়ি তার কলা-কৌশল ব্যর্থ বুঝে শেষে বলেন, বেয়াই মশাই বলেছেন, হৈমন্তীর বয়স ১১ বছর। এই কথা বলাতে হৈমী প্রতিবাদ করেছেন। হৈমন্তী বলেছেন আমার পিতা এ কথা বলতেই পারেন না। আমরা গল্পের অভ্যন্তরে দেখতেপাই ---

> "আমি তাহার হাতখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, 'হৈম আমার উপর রাগ করিয়ো না। আমি তোমার সত্যে কখনো আঘাত করিব না। আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা। হৈম কিছু না বলিয়া একটুখানি হাসিল। সে হাসি বিধাতা যাহাকে দিয়াছেন তাহার কোনো কথা বলিবার দরকার নাই।"[৫]

হৈমন্তী সম্পর্কে অপুর ধারণা ছিল 'হৈমী' উদার মানসিকতার আধুনিক নারী। অপু উল্লেখ করেছেন ---

> "এক তো হৈমর ভালোবাসার মধ্যে এমন একটি আকাশের বিস্তার ছিল যে, সংকীর্ণ আসক্তির মধ্যে সে মনকে জড়াইয়া রাখিত না, সেই ভালোবাসার চারিদিকের ভারি একটা স্বাস্থ্যকর হওয়া বহিত। দ্বিতীয়, পরীক্ষার জন্য যে বইগুলি পড়ার প্রয়োজন তাহা হৈমর একত্রে মিলিয়া পড়া অসম্ভব ছিল না।"[৬]

প্রথম মহাযুদ্ধের ইউরোপে পুরনো মূল্যবোধ ভাঙতে শুরু করেছে। সেখানেও আসন্ন হয়ে উঠেছে নারীর অধিকার নিয়ে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম। রাজনৈতিক-সচেতন আন্দোলন, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, দেহের শুচিতা ও নৈতিকতা বিষয়ক ধ্যানধারণার ঘটেছে আমূল পরিবর্তন। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখেছিলেন ---

'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী ও নীলা- দুই আধুনিক নারীকে আমরা পেলাম। লেখক সোহিনীকে অসামান্য করে তুলেছেন তার চারিত্রিক স্খলনে, যা থেকে প্রৌঢ়ত্বেও তার উদ্দার নেই। সোহিনীর আধুনিক মন, পাপ সম্পর্কে তার নিঃসঙ্কোচ মনোভাব, সংস্কারের বেড়াজালে তাকে বাঁধা যায় না। দেহ ও মন বিষয়ে সে কোন সংস্কারের বশবর্তী নয়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের মধ্যে দিয়ে সোহিনী চরিত্রের উদারতারো প্রগতিশীল দিকটিকে আমাদের সম্মুখে ধরেছেন। সোহিনী নানা প্রতিবন্ধকতা ও বাঁধা দূর করে স্বামীর স্বপ্নকে রক্ষা করা এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ বলে মনেকরে। সোহিনী উল্লেখ করেছেন ---

> "আমি সমাজের আইন কানুন ভাসিয়ে দিতে পারি দেহের টানে পড়ে। কিন্তু প্রাণ
> গেলেও বেইমানি করতে পারব না। আমার ল্যাবরেটরির এক পয়সাও তারা
> খসাতে পারেনি।"[৭]

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক জীবনের জটিলতা, মনের বিচিত্র গতির অন্বেষণ করেছেন সোহিনীর মধ্য দিয়ে। সোহিনী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তিনি নারীমুক্তির নিশান্ত সংগীত বাজিয়ে দিলেন। নারীকে স্বতন্ত্র মূল্যে পৌঁছে ছিলেন আধুনিক সময়ের দোরগোড়ায়।

একথা ঠিক রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুপ্রকার নারী উচ্চমর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবুও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উত্থানের মধ্যে যে আপস রবীন্দ্রসাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীপ্রগতির ক্ষেত্র এই ধরণের একটা সমন্বয় সাধনের মধ্যদিয়ে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই শ্রমিজীবী, স্বাবলম্বী, সমাজ সচেতন সংগ্রামী নারীরা কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে তেমনভাবে স্থান পায়নি। আজ রবীন্দ্রযুগ বা নবজাগরণ বা স্বাধীনতার যুগ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে এসেছি। সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর আংশিক আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীপুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তি অনেকাংশে স্থাপিত হয়েছে। নারীর সমান অধিকার, শিক্ষা-সংস্কৃতির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার আজ শুধু সাংবিধানিক স্বীকৃতিই পায়নি, বাস্তব সমাজের প্রয়োজন হিসেবেও স্বীকৃতি পেয়েছে আজকের দিনে প্রগতিশীল শিল্পে-সাহিত্যে, সমাজ পরিবর্তনের সংগ্রামের সমান অধিকার, আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠা সংগ্রামের নারীর সক্রিয় ভূমিকা নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, নারীর একান্ত নিজস্ব বয়ানই হয়ে উঠতে পারে নারীবীক্ষার প্রকৃত পথ ও প্রতিষ্ঠা। তাই এই পর্বে সমকালীন যে নারী পাঠকৃতি তার দু-একটি বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বা আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে দেখা যায় কত যে বিচিত্র শাখা প্রশাখায় ছড়িয়েগেছে নারীবীক্ষা, তারসীমা-পরিসীমা নেই। নারীচেতনা বলি কিংবা নারীপাঠকৃতি, বহুস্বরিকতা ও অনেকান্তিকতা এখন এর অভিজ্ঞান। এই শতকেই মেয়েরা পূর্ববর্তী শতকগুলির তুলনায় অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে, দ্রুত জীবন ও জগতের আস্তিত্বিক-নান্দনিক-জ্ঞানতাত্ত্বিক পূর্নমূল্যায়নের নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে নিলেন। নারীর নতুন সংজ্ঞা নিজেরাই তৈরি করে নিতে চাইছিলেন তারা। এই প্রসঙ্গে আশাপূর্ণাদেবী, সাবিত্রী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুলেখা সান্যাল, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, তসলিমা নাসরিন, নবনীতা দেবসেন, মল্লিকা সেনগুপ্ত, সুতপা ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখিকাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

মহাশ্বেতা দেবী মেয়েদের ইতিহাসকে পৃথক করে দেখানোর প্রয়াস করেননি। তাঁর গল্পে থাকে মেয়েদের স্থান। তাই একটি মেয়েরগল্প থেকে তিনি একটি শ্রেণির ইতিহাসে পৌঁছে যেতে পারেন অনায়াসে। 'বিশালাক্ষীর ঘর' গল্পটি যেমন। এ গল্পের নায়িকা বিশালাক্ষী ওরফে বিশু বড় ঘরের মেয়ে হয়েও কোনো কিছুই আপন করে হাতে পায়নি কোনোদিন। মানুষ ওকে শুধু ব্যবহার করেছে একদিকে, অন্যদিকে গালাগালি করেছে। বিশু কিন্তু আত্মসচেতন মেয়ে নয়, 'বিশুকে যারা গামছার মতো মুড়ে মুড়ে কষ্ট দেয়, ও তাদের জন্যই জীবন দেয়। এটা ওর স্বভাব।' সুতরাং বিশুও সমাজে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়। সেই প্রতারণার ইতিহাসই একভাবে এদেশের আর্থসামাজিক ইতিহাসের দলিল, যার ভিতর দিয়ে শ্রেণি হারাতে হারাতে বিশু একদিন ভারতের নিঃস্ব দরিদ্র-উপবাসীর শ্রেণিতে পৌঁছে যায়। এই গল্পের অভ্যন্তরে মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন ---

> "বিশুর চোখ জলে ভেসেগেল। কত বড় সমাজের মানুষ সে এখন। শ্রেণী হারাতে হারাতে সে এখন ভাতের নিঃস্ব দরিদ্র উপবাসীর শ্রেণীতে পোঁছে গিয়েছে। তার শ্রেণী তার সমাজ সব চেয়ে বড়, সব চেয়েবেশি সে সমাজের ক্ষমতা। ভিখারীর জাত মানে কে?"[৮]

লেখিকা চূড়ান্ত শ্লেষ মিশ্রিত কণ্ঠস্বরে বলেন : 'তার শ্রেণী তার সমাজ সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে বেশি সে সমাজের ক্ষমতা। ভিখিরির জাত মারে কে?' এই শ্লেষের মূলে আছে রাজনৈতিক বোধ। সেই রাজনৈতিক বোধই তাঁর গল্পের নিয়ন্তা। সে রাজনীতিকে তিনি ইতিহাসে, বর্তমানে, পুরুষতন্ত্রে, রাষ্ট্রতন্ত্রের সর্বত্র সনাক্ত করেন। নারীর উপর রাষ্ট্রীয় আঘাতের তীব্রতম ছবি রয়েছে 'দ্রৌপদী' গল্পে। ধর্ষণ ব্যাপারটি শুধু যে পৌরুষত্বের বিকৃত প্রতীক নয়, তা যে রাষ্ট্রের লজ্জা-এ কথা প্রকাশিত হয়েছে অসামান্য ভাষায়। গল্পটি শুধু সেই রাষ্ট্রশক্তি ও পুরুষশক্তির গণধর্ষণের বর্ণনার অসামান্যতাতেই অসাধারণ হতে পারতো। কিন্তু তার অসাধারণত্ব আরো বেশি সেইখানেই, যেখানে দ্রৌপদী তার নগ্ন শরীরকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, শাসকশক্তি সেখানে ভয় পেতে বাধ্য হয়। এই গল্পটির মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদের বিষয়টি অন্যভাবে আমাদের সম্মুখে উঠে এসেছে। দ্রৌপদী প্রতিবাদ করেছে জলের ঘটি উপুড় করে ফেলে দিয়ে। আবার মেয়েদের ব্যবহার করা শাড়িটি দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিড়ে ফেলে। তার এই দুর্বোধ্য আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রতিবাদ সোচ্চারিত হয়েছে।

> "জেলে পাগলঘন্টি পড়লে যেমন হয়, ছুটোছুটি লেগে যায় এবং সেনানায়ক
> বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন সূর্যের প্রখর আলোয় উলঙ্গ দ্রৌপদী সোজা
> মাথায় হেঁটে তার দিকে আসছে। সন্ত্রস্ত সাস্ত্রিরা কিছু তফাতে।
> এটা? বলতে তিনি থেমে যান।
> দ্রৌপদী তার সামনে এসে দাঁড়ায়। উলঙ্গ। উরু ও যোনিকেশে চাপ চাপ রক্ত।
> স্তন দুটি ক্ষতবিক্ষক এটা? তিনি ধমকাতে যান।
> দ্রৌপদী আরও কাছে আসে ... তা কেমন বানিয়েছে দেখবি না?
> কাপড় কই ওর কাপড়?
> পরছে না সার। ছিঁড়ে ফেলেছে।
> দ্রৌপদীর কালো শরীর আরও কাছে আসে। ... কাপড় কী হবে, কাপড়? লেংটা
> করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু?"[৯]

অপরদিকে মহাশ্বেতা দেবীর 'তালাক', গল্পটির মধ্যে দিয়ে কুলসুমের প্রতিবাদ আমাদের সামনে উঠে এসেছে। এই গল্পেকুলসুম খুব কষ্ট করে সংসারটিকে দাঁড় করিয়েছিল। সংসারটি যখন সচ্ছলতার দিকে এগিয়ে যায়, তখনই একদিন কুলসুমকে তার স্বামী তালাক দিল। আরসাদ সদর্পে বলল,

> "তোরে আমি তালাক দিলাম,
> 'তালাক দিলে'
> 'দিলাম।'
> আরসাদ চেঁচিয়ে বলল, 'তালাক', তালাক! তালাক!'
> 'ই তুমি কী করলে গো?'
> কুলি মূর্চ্ছা গেল।"[১০]

আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের খুব সহজেই যে পরিত্যাগ করা যায় তা এই গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখিকা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কুলসুম কোন দিন আরসাদকে অসম্মান, অমর্যাদা করেনি। সর্বদা তার প্রসংসা মুখে লেগেই থাকত। অপরদিকে কুলসুম কোনদিন বিপথে পরিচালিত হয়নি। সর্বদা সে নিজের স্বামী ও সন্তানকে সাধ্যমতো লালন-পালন করে এসেছে। বিবাহের প্রথম দিকে আরসাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও কিছুটা অভিমান মনের ভিতরে থাকলেও পরবর্তীতে তাদের সংসারে সুখের অন্ত ছিল না। তা অনেকেরই মনে হিংসার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আরসাদের হঠাৎ নির্মম চরিত্র কুলসুমের সামনে উপস্থিত হওয়াতে প্রাথমিকভাবে কুলসুম প্রবল ধাক্কা খায়। পরবর্তীকালে আরসাদ নিজেও অনুতপ্ত এই ঘটনার জন্য। অপরদিকে কুলসুমের নিজের হাতে তৈরি সংসারটির জন্য কুলসুমের মনে আঘাত করে। আরসাদ যখন পুনরায় কুলসুমকে নিকাহ করার প্রস্তাব পাঠায়, তখন কুলসুম তীব্রভাবে এই নিকাহ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কুলসুমের এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র নিকাহ প্রথার বিরুদ্ধেই নয়, একই সঙ্গে ঘুণধরা পচা গলা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তাই গল্পে দেখা যায় ---

> "কুলির চোখে জল এল। হারা বলল, 'নিছয়'। তবে আর কি। ক-কুড়ি টাকার মামলা। আবার নিয়ে বসুক কুলসুম। গাঁয়ের ইরফান মন্ডল রাজি আছে। বসবাসের ক রাত কাটলে রে ইরফান কুলিকে তালাক দেবে। তখন আরসাদ তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে ঘরে। কুলি শুনে ছি ছি ছি করে উঠল। পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে একবার অন্য কারো দিকে চায়নি কুলি। ছেলেকে সামনে রাগে বোনাইদের ভাত দিয়েছে। আজ এই বয়সে সাতাশ বছরের ছেলের সামনে সে এই কাজ করবে?"[১১]

এই 'তালাক' গল্পের মধ্যে কুলসুম তালাক প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েই থেমে থাকেননি, আমরা দেখতে পাই কুলসুমের মধ্যে বিকল্প চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটেছে, এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য। বিকল্প চিন্তার মধ্যে দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধানের পথকেই মহাশ্বেতা দেবী তাঁর গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। লেখিকার কৃতিত্ব এখানেই যে, অশিক্ষিত মুসলিম সমাজের পিছিয়ে পড়া এক নারী হিসাবে কুলসুমের প্রতিবাদ এবং বিকল্প পথের মধ্য দিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করার সাহস আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কুলসুম চরিত্রটির মধ্যে প্রগতিশীল চিন্তাধারার ছাপ স্পষ্ট।

মহাশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত ছোটগল্প 'যমুনাবতীর মা' (১৩৭৯) গল্পের মধ্যে দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণের তীব্রতম নির্মম রূপ ফুটে উঠেছে। সমাজব্যবস্থায় শোষিত এবং শোষকদের বৈপরীত্য চিত্র উঠে এসেছে। এই সমাজ ব্যবস্থায় গরীব হওয়া অপরাধ তার উল্লেখ এখানে রয়েছে। যমুনাবতী, যমুনাবতীর মা, বাবা এরা সকলেই গরীব হওয়ার কারণে ঠিক মতো খেতে পায়না। নিজেদের একমাত্র কন্যা যমুনাবতীকে অপুষ্টিজনিত কারণে অকালে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়। ধনবাদী ব্যবস্থায় এই সমাজের কাছে এরা বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমাজের চোখে এরা ফালতু। এদের জন্যই ধনবাদী সমাজের রাস্তাঘাট রেললাইন সর্বত্র অপরিষ্কার। এদের জন্যই কে.এম.ডি.এ কে সুন্দরভাবে সাজানো যায় না, কোথাও আবার ফুটপাতগুলি নোংরা থাকে। এদের কারণেই ধনবাদী সমাজ অসুখী। লেখিকা সুন্দরভাবে তারেই গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন সমস্তকিছু থাকা সত্ত্বেও এরা ঠিকমতো খাবার ও ওষুধ চিকিৎসা কোন কিছুই এদের জন্য নয়। যা আছে তা কেবলমাত্র বড়লোকদের জন্য। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে আরও জানা যায় যে রাষ্ট্রনেতারা ভোটের সময় কোন কিছুর প্রতিশ্রুতি দিতে বাদ রাখেন না। এদের জন্য বড় বড় প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দেন। গল্পের অভ্যন্তরে আমরা দেখতে পাই ---

> "দেয়ালে, লাইটপষ্টে এত ছবি, এক কথা? সুখী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে দেব। যুগ সূর্য তুমি। সমাজবাদের পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া? গরীব হটাবার হুমকি?"[১২]

এই গল্পের মধ্যে নীরব প্রতিবাদ এবং একবুক ভরা বেদনা নিয়ে পৃথিবীতে তারা অবস্থান করে। তাই গল্পের শেষে আমরা দেখি ---

> "ওর মতো মানুষগুলোকে ফেলে দিতে না পারলে এ শহর, এ জীবন, এ দেশ, কিছু সুন্দর হবে না। ওরা আছে বলেই সকলের কাজের পথে এত বাঁধা। মনে হয় ওর মতো মানুষগুলোর জন্যে এখনি কোন, জরুরি ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এত বৈজ্ঞানিক, এত পরিকল্পনা, এত গ্যাস, এত চেম্বার, ব্যবস্থা কি হয় না?"[১৩]

মহাশ্বেতা দেবীর আর একটি বিখ্যাত গল্প 'শিকার'। এই গল্পটির মধ্যে আদিবাসী মহিলা ভিকনীর উপর অত্যাচার করা হয়েছে শুধুমাত্র তাই নয় ভিকনী প্রতারিত হয়েছে বিদেশী বাবুর কাছ থেকে। এই ভিকনীর গর্ভে জন্ম হয় মেরীর। মেরী আদিবাসী সমাজের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও মনে হয় না মেরী আদিবাসী যুবতী। কারণ মেরী যেমন দেখতে সুন্দর, তেমন সুন্দর গাঁয়ের রং তেমনি লম্বা। বিখ্যাত এই ছোটগল্পটির মধ্যে একাধিক নারী-পুরুষের চরিত্র থাকলেও মেরী তাদের মধ্যে অন্যতম। মেরী প্রথম থেকে তার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন। মেরীর কথাবার্তায় এবং কাজকর্মে ব্যক্তিত্ব-বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসাদজীর বাড়ি থাকা অবস্থাতেই মেরী তোহরী বাজার পার্শ্ববর্তী জনসমাজ এবং বনাঞ্চল তার নখদপর্ণে। ভিকনীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অষ্ট্রেলিয়া যুবক যে প্রতারিত করেছিল সে অভিজ্ঞতা মেরী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। আদিবাসী সমাজ থেকেও মেরীকে গ্রহণ করার মানসিকতা দেখায়নি। মেরী বাধ্য হয়ে জালিমকে প্রণয়ী হিসাবে বেছে নিয়েছি। জালিম বিয়ে করবে এই শর্তে সে জালিমকে কাছে আসতে দিয়েছে। আদিবাসী সমাজ মেরীর গাঁয়ের রং সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করত। মেরীকে আদিবাসি সমাজ ভালোবাসলেও কোথাও

যেন একটি সম্পর্কের মধ্যে প্রাচীর বা দেওয়াল ছিল বলে আমাদের মনে হয়েছে। অনেকেই মেরী প্রণয়ী হতে চেয়েছে। কিন্তু মেরী প্রত্যাখ্যান করেছে। মেরী উন্নত সভ্য সমাজে বাস করার স্বপ্ন দেখেছে। সে মনে করে সমাজে থেকে মেরী উন্নত জীবন যাপন করতে পারবে না। যেমন---

> "ওঁরাও মায়ের মেয়ে, দেখতে অন্যরকম, লম্বা বেশি। তাই সজাতে ওর জন্যে ছেলে মেলেনি। আদিবাসী যুবকদের কাছে মেরীর গাঁয়ের রং একটা প্রতিরোধের দেওয়াল। ছেলে দেখেছিলেন প্রসাদ গিন্নী। ওঁদের মালীর ছেলে। বলেছিলেন, এখানেই থাকবি। ভিকনী বর্তে যায়। মেরী বলে, 'না। মা জী বলেছে তার কাজের লোক বাঁধা থাকবে বলে।'
> ঘরে দেবে?
> ঝোপড়ি।
> ছেলেটা ভালো।
> না, ঝোপড়িতে থাকব, ঘাটো খাব, মরদ মদ খাবে, তেল-সাবান পাব না, ফর্সা কাপড় পরব না অমন জীবন চাই না। মেরী রাজী হয়নি। গ্রামসমাজে ও স্বীকৃত। মেয়েরা ওর জন্য পালা পার্বণে নাচতেও অদ্বিতীয়। তাই বলে ওদের জীবন কাটাতেও চায় না। প্রণয়ী হতে চেয়েছে, বহুবার বহুজন। মেরী দা তুলে দেখিয়েছে। তারা বাইরের মানুষ। ভিকনির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা নিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতেপারে।"[১৪]

উপরোক্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মেরী চরিত্রের প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার পরিচয় আমাদের সামনে উঠে আসে। মেরী কারও কাছে করুণার পাত্রী হিসাবে থাকতে পছন্দ করেনা। বিনা পারিশ্রামিকে তাকে অনেকে খুশী করতে চাইলেও সে তাদের দানকে প্রত্যাখ্যান করে। যেমন করেই হোক সে নিজে পরিশ্রম করে পয়সা উপার্জন করবে। সে সেই অর্জিত পয়সাতেই সংসার গড়তে চায়। তহশীলদার ও তার মতো অনেকেই মেরীকে খুশী করার জন্য উপঢৌকন দিতে চাইলে, মেরী শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, তীব্রভাষায় তহশীলদারকে ভৎসর্না করেছে, ভবিষ্যতে যেন এইরকম কাজ না করে তাও বলে দিয়েছে। প্রসাদ গিন্নী মেরীর জীবন ও বিবাহ নিয়ে প্রশ্ন করলে মেরীর কথোপকথনে তার চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রগতিশীলতার পরিচয় ফুটে ওঠে। যেমন---

> "গরীব মানুষের কথা শুনে আপনি সাদী দিয়ে দেবেন? রাম রাম? মুসলমানের সঙ্গে? আমি সাদী দেব? কেন? মুসলমান তো সাদি করবে বলেছে। আপনার ভাই তো রাখতে চেয়েছিল।"[১৫]

'শিকার' গল্পের মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী মেরীর মধ্যে প্রতিবাদ এবং প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। মেরী আদিবাসীদের বাৎসসরিক উৎসব শিকারের দিনে সে বেছে নিয়েছে জীবনের বাধাদানকারী মানুষটিকে (তহশীলদারকে) শিকারের বস্তু হিসাবে। খুব বুদ্ধিমানের সঙ্গে তহশীলদারের অত্যাচারের হাত থেকে সে নিজেকে রক্ষা করেছেন। তহশীলদারের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার মধ্যে না গিয়ে কৌশল অবলম্বন করে এই সমস্যার সমাধান করে। জালিমের হাত ধরে এই গ্রাম ছেড়ে চিরতরে চলে যায়, নতুন জীবন গড়বে বলে।

আবার 'স্তনদায়িনী' গল্পের মধ্যে দেখা যায় যশোদা গরীব ব্রাহ্মণের বউ। আর্থিক অনটনের জন্য গ্রামের বড়লোকের সন্তানদের নিজের বুকের দুধ খাওয়ায় এবং তাদের মানুষ কর। দুবেলা দুমুটো অন্নের জন্যও তাকেও বড় বাবুদের সন্তানদের দিকে তাকিয়ে সন্তান ধারণা করতে হতো। নানারকম ভাগ্য বিড়ম্বনা, বাঁধা অতিক্রান্ত করেও জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার প্রত্যাশা যশোদার মধ্যে পরিলক্ষিত কর যায়। যশোদাকে যখন দুরারোগ্য ব্যাধি গ্রাস করতে বসেছে তখনও হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে তার মনে হয়েছে---

> "সে তো বিশ্বসংসারকে দুধ দিয়েছে, তবে সে কি একা একা মরতে পারে? যে ডাক্তার রোজ দেখছে সে, যে ওর মুখের চাদর টেনে দেবে সে, যে ওকে ট্রলিতে তুলবে সে, যে ওকে শ্মশানে নামাবে সে, যে ওকে চুল্লিতে দেবে সে ডোম, সবাই তার দুধ ছেলে। বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না।"[১৬]

আমাদের বাংলা সাহিত্যের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান বলে ছোটগল্প পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বাংলা ছোট গল্পের আবির্ভাব ঘটে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বাংলা ছোট গল্পের উন্মেষ ঘটে। অপরদিকে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পকার হিসাবে আবির্ভাব ঘটে বাংলা ছোট গল্পের প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবীর আবির্ভাব ঘটে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। স্বাভাবিক ভাবেই দুজন ছোটগল্পকার সময়ের ব্যবধান প্রায় ৬০-৭০ বছরের।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথ যখন ছোটোগল্প লেখা শুরু করেছিলেন সুদীর্ঘকাল ব্যাপী চলে আসা সামাজিক অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা ছিল, তা হলো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই পচা-গলা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভগ্নাবশেষের মধ্যে তাঁর আবির্ভাব। কোথাও আবার জমিদারী শাসন ব্যবস্থাও চালু ছিল এই সমাজ ব্যবস্থায়। স্বাভাবিকভাবেই নারীদের মর্যাদা ও সম্মান দেওয়া এই ব্যবস্থার মধ্যে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সমাজ জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ছিল সুগভীর। সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাঁর লেখা ছোটগল্পগুলির মধ্যে নারী মনের কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও আবার স্পষ্ট প্রগতি ভাবনা উঠে এসেছে। নারী

কোথাও অত্যাচার নীরবে সহ্য করেছে, সামাজিক বন্ধনের জন্য। কোথাও আবার নীরবতার মধ্যে সামাজিক অত্যাচার না মানার ভাবনাকেও ফুটিয়ে তুলেছেন। কোন কোন গল্পের মধ্যে গল্পের মধ্যেও আবার নারীর ভাবনায় প্রগতিশীল, উদার মানসিকতা পরিলক্ষিত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রায় পাঁচ দশক ধরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবাধ চলাফেরা করেছেন। মানুষের কাছাকাছি থেকে গভীরভাবে অনুধাবন না করলে তিনি এই ধরণের সমাজ বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে পারতেন না। সমাজের নানা দিক থেকে নারীকে গভীরভাবে অনুধাবন করলেই সাহিত্যে তা তুলে ধরা সম্ভব। তাঁর বিভিন্ন ছোটগল্পের মধ্যে যেমন মহামায়া, পোস্টমাস্টার, শাস্তি, দেনাপাওনা, স্ত্রীরপত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরি নারির প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রকাশ আমরা পেয়েছি। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় যেমন ভাবে নারীকে শোষণ ও নিপীড়নের শিকার হতে হয় পাশাপাশি পুরুষতান্ত্রিকতায় নারীর মর্যাদা, সম্মান অধিকার সবকিছুকেই সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃত দেওয়া হয় না। কারণ এই ব্যবস্থায় নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়, তার কাজ ও দায়িত্ব বলতে শুধু সন্তান উৎপাদন করা সন্তান-স্বামী ও অন্যান্যদের সেবা যত্ন করা। শিক্ষার জগতে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ, কোথাও আবার শিক্ষার আলো পৌঁছলেও তাদের সংসারে আবদ্ধ থাকতে হতো।

মহাশ্বেতা দেবী স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলা ছোটোগল্পকারদের মধ্যে অন্যতম। স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৩৯ সালে 'রংমশাল' পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু করেন। মহাশ্বেতা দেবী মানুষের জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছিলেন। আদিবাসী জনসমাজ এবং বনাঞ্চলে নিজে দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। তাদের সঙ্গে বসবাস করেছেন। তাদের জীবন যন্ত্রণা-দুখঃ কষ্টের অংশীদার হয়েছেন স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আমাদের দেশের জাতীয় সরকার জমিদারতন্ত্রের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করেন এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু করেন। অপর দিকে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্যসংকট প্রভৃতি তীব্র আকার ধারণ করে। স্বাধীন ভারতবর্ষে শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে থাকলো ধীরে ধীরে, এমতবস্থায় আর্থ সামাজিক কাঠামোর মধ্যে যে শ্রেণিগত অবস্থান ও পূর্বেকার মতো বজায় ছিল না। মহশ্বেতা দেবীর বিখ্যাত ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিশালাক্ষীর ঘর, তালাক, শিকার, দ্রৌপদী, যমুনাবতীর মা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমরা লক্ষ্য করি এই গল্পগুলির মধ্যে নারীচরিত্র, বিশালাক্ষী থেকে কুলসুম, মেরী, দ্রোপদী, যশোদা, যমুনাবতীর মা প্রত্যেকেরই মধ্যে প্রগতি ভাবনার পরিচয় লেখিকা উল্লেখ করেছেন। 'তালাক' গল্পের মধ্যে আমরা দেখি যে মুসলমান সমাজে কত সহজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়। বিচ্ছেদ ঘটার পর উভয়ের মধ্যেই মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয়। কুলসুমকে গ্রহণ করতে হলে পুনরায় অন্য একজন পুরুষের সঙ্গে সাদী করতেহবে, তারপর কুলসুমকে আবার নিকাহ করতে পারবে। এই ধর্মীয় শাসনকে কুলসুম কোনমতেই মানতে চাই না, অপরদিকে আরসাদকেও ছাড়তে চায় না, এই সমাজকে প্রত্যাখ্যান করে শহরে নতুনভাবে জীবন গড়ে তোলার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়। এখানে আমরা দেখতে পাই স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা, এই জন্য সমাজকে সরাসরি উপেক্ষা করার ক্ষমতাও তার নেই, তাই শেষে শহরে নতুন জীবন গড়ার জন্য পালিয়ে যায়।

পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের নারী কুলসুমের আত্মপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি প্রগতিশীল চিন্তাধারাও তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আবার আদিবাসী সমাজের জীবন যন্ত্রনার চিত্র-ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন মহাশ্বেতা দেবী 'শিকার' গল্পের মধ্যে দিয়ে। আদিবাসী সমাজের মেয়ে মেরীর জন্ম ইতিহাস এবং তার গাঁয়ের রং ঐ সমাজের চোখে এবং অন্যান্যদের চোখে ইর্ষার কারণ। কোন পাত্রই মেরী গ্রহণ করতে রাজী নয়। আবার একপ্রকার বাধ্য হয়ে মুসলিম সন্তান জালিম তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং মেরীকে নিয়ে অন্যত্র নতুন সমাজে বাস করতে রাজী।

কোনরকম লোভ লালসা নেই মেরীর মধ্যে। বাবুদের উপঢৌকন প্রত্যাখ্যান করেন। বাৎসরিক অনুষ্ঠানের দিনে যেভাবে কামাতুর তহশীলদার সিংকে শিকারের বস্তু হিসাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তা তার উন্নত বুদ্ধির পরিচয় বহন করে। লেখিকা দেখিয়েছেন মেরী ছোটবেলা থেকে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার মধ্যে হচ্ছিল। এই সমাজ তাকে বাধ্য করিয়েছে অন্যত্র পালিয়ে যেতে। এই সমাজ তাকে গ্রহণ করে না উপরন্তু সমালোচনা করতে পিছপা হয়নি। আদিবাসী জনসমাজের অশিক্ষিত একজন মেয়ে মেরী প্রসাদজীর বাংলোর কাছে বিভিন্ন বাজার ঘাট-শহর পরিক্রমা করেছে, কখনও মেষ, ভেড়া, গরু পালন করেছেন, আবার বাবুদের বাগানের সাবু বিক্রি করেছে, স্বাভাবিকভাবেই মেরী এই সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ঠ জ্ঞান অর্জন করেছিল। এই অভিজ্ঞতাই তাকে শিক্ষা দিয়েছিল। এই সমাজ তার পক্ষে সঠিক জায়গা নয়। অশিক্ষিত আর এক হতভাগিনী নারী যশোদার কাহিনী নিয়ে 'স্তনদায়িনী' ছোট গল্পটি। এই গল্পটির মধ্যে আমরা মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়াছেন, যশোদা কিভাবে অপরের সন্তানের সেবা করতে গিয়ে তার জীবনে কত দুঃখ কষ্ট নেমে এসেছে। যশোদা হাসপাতালে শয্যায় শুয়ে তার মনে হয়েছে এই ডাক্তার বাবুও তার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে, একসময়ে তার মনে হয়েছে। এ যেন বিশ্বমাতা পৃথিবীর সকলের সন্তানের মাতা তিনি। এই যে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়ে অপরের সন্তান মানুষ করতে করতেতার মনে ধারণা হয়েছে বিশ্বজননী তিনি পৃথিবীর সকল সন্তানই তার এই বিশ্বজননী হওয়া দুস্কর। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্পের এখানেই সার্থকতার চূড়ান্ত নিদর্শন আমাদের সামনে। নারীসত্তার সামাজিক নির্মাণ একদিন হয়ে এসেছে যেভাবে সেখানে পুরুষই ছিল তার নিয়ন্ত্রক শক্তি। তাই বর্তমান সময়ে সংযোগ ভাবনায় নারীর নিজস্ব লেখা, নিজস্ব পাঠকৃতি, নিজস্ব বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৭১১
২। তদেব, পৃঃ ৮৪৯-৮৫০
৩। *গল্পগুচ্ছ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহামায়া, সাহিত্যম, পৃঃ ১৪২
৪। *গল্পগুচ্ছ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শাস্তি, সাহিত্যম, পৃঃ ১৭৬
৫। গল্পগুচ্ছ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হৈমন্তী, সাহিত্যম, পৃঃ ৫৯১
৬। তদেব, পৃঃ ৫৯২
৭। *গল্পগুচ্ছ*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ল্যাবরেটরি, সাহিত্যম, পৃঃ ৭৫১
৮। *মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, বিশালাক্ষীর ঘর, পৃঃ ২৫৪
৯। *মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠগল্প*, দে'জ পাবলিশিং, দ্রৌপদী, পৃঃ
১০। *মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, তালাক, পৃঃ ১৬
১১। তদেব, পৃঃ ১৭
১২। *মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, যমুনাবতীর মা, পৃঃ ৩২৮
১৩। তদেব, পৃঃ ৩৩০
১৪। *মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, শিকার, পৃঃ ২৩
১৫। তদেব, পৃঃ ২৪-২৫
১৬। *মহাশ্বেতা দেবীর ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, স্তনদায়িনী, পৃঃ ৫০৫

সহায়ক গ্রন্থ:

১। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, *গল্পগুচ্ছ*, সাহিত্যম, কলকাতা-৭০০০৭৩
২। *মহাশ্বেতা দেবী ৭৫টি গল্প*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা – ৭০০০০৯
৩। গুপ্ত ক্ষেত্র সম্পাদিত *রবীন্দ্র-গল্প নারীর বিদ্রোহিনী*, পুস্তক বিপণি, নভেম্বর ২০০২
৪। ভট্টাচার্য তপোধীর, *নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে*, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০৭
৫। ভট্টাচার্য সুতপা, *মেয়েলি পাঠ*, পুস্তক বিপণি, জানুয়ারি ২০০০
৬। মজুমদার উজ্জ্বলকুমার সম্পাদিত, *গল্পচর্চা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা
৭। চক্রবর্তী সাবিত্রী নন্দ, *আধুনিক বাংলা ছোটগল্প : মূল্যবোধের সংকট*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৮। মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, *কালের পুত্তলিকা, বাংলা ছোটগল্পের একশ দশ বছর* / ১৮৯১-২০০০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০০৭৩, এপ্রিল – ২০০৪

*****